বিশ্বলোককথার রূপরেখা

ড. সুধীরকুমার করণ

পুনশ্চ

৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৯

নি বে দ ন

এই গ্রন্থটি লোককথার কোন সংকলন গ্রন্থ নয়, যদিও আলোচনাসূত্রে অনেক লোককথার সন্নিবেশ ঘটেছে। সারা বিশ্বের লোককথার গতি প্রকৃতি এবং স্বরূপ সম্পর্কে আলোচনা সূত্রেই গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। লক্ষ্য করা গেছে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লোককথার নিজস্ব ধারা ঐতিহ্যিক বা ট্রাডিশনাল সূত্রে প্রবহমান, এবং তা সত্ত্বেও সব দেশের লোককথার উপর অন্যান্য দেশের লোককথার প্রভাব সংমিশ্রণ (Influence, assimilation, diffusion) ইত্যাদিও আবিষ্কার করা যায়। তাই, বর্তমান কালে, পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তের লোককথার আলোচনাসূত্রে সেই সব লোককথার স্বরূপও সন্ধান করতে হয়। এই গ্রন্থে সেই চেষ্টাই করা হয়েছে। বিশেষ করে পৃথিবীর বহুদেশের লোককথার উপর স্পষ্টতই ভারতীয় প্রভাব ধরা পড়ে। ভারতবর্ষই যে লোককথার রক্ষণাগার, বহুপণ্ডিতের এই অভিমতকে অগ্রাহ্য করা চলে না। তাই বিভিন্ন দেশের লোককথার স্বরূপ আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতবর্ষের প্রসঙ্গও এসে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এই গ্রন্থের পরিসরে সারা বিশ্বের লোককথার কোন বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয় বলে শুধু তাদের রূপরেখাকেই চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। লোককথা সম্পর্কে উৎসাহী পাঠকের কাছে এই গ্রন্থটি একটি পথনির্দেশক গ্রন্থ রূপেই গৃহীত হতে পারে বলে আমার ধারণা। দীর্ঘদিন ধরে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি চর্চার ফলে আমার যে কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এই গ্রন্থ তাদেরই অন্যতম।

কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করে লোককথা চর্চায় লিপ্ত হয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছরের মধ্যে লোককথার বিভিন্ন ধারা ও লোককথার স্বরূপ সম্পর্কে আমার ধারণাকে চিহ্নিত করার জন্য আমি দুটি গ্রন্থ রচনা করি, যথা—লোককথার দিক্‌দিগন্ত (বিহার বাঙলা আকাডেমী পাটনা কর্তৃক প্রকাশিত) এবং বিশ্বলোককথার রূপরেখা (পুনশ্চ, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত) অর্থাৎ বর্তমান গ্রন্থ। আশা করি, এই গ্রন্থটি উৎসাহী পাঠকদের মধ্যে লোককথা চর্চার উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করবে। তা হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে।

এই প্রসঙ্গে গ্রন্থটির প্রকাশক শ্রীশঙ্করীভূষণ নায়কের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তাঁকে শুধু সাধারণ মানের একজন প্রকাশক বলে মনে করা চলে না। তাঁর মধ্যে তাঁর নিজস্ব এমন কিছু চিন্তা-ভাবনা এবং আইডিয়ার জগৎ লক্ষ্য করেছি—যা অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে একজন বিশিষ্ট প্রকাশক রূপে চিহ্নিত করে রাখবে।

এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরী করার সময় এবং অন্যান্য সময় আমার সহৃদয় বন্ধু—অবসরপ্রাপ্ত আই. এ. এস শ্রী অতুল কুমার দত্ত ও অধ্যাপক পঙ্কজ ঘোষ এবং আমার স্নেহভাজন গবেষক-ছাত্র বসুধা (বর্ধমান) নিবাসী শ্রী সাধন ভট্টাচার্য, এম.এ., আমার কর্মভার যেভাবে লাঘব করেছেন,—তার জন্য তাঁর কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। আমার সহধর্মিনী মীরা করণও তাঁর সহমর্মিতা দিয়ে যেভাবে আমার বহু শ্রমের অপনোদন ঘটিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া বৃথা। তিনি তার অনেক ঊর্ধ্বে—।

ইতি—
সুধীর করণ

৩ ডি উত্তরা
১৩ নং ব্রড স্ট্রীট, কলিকাতা—১৯
১৫/১১/৯৬

ক্র ম সূ চি

বিষয়		পৃষ্ঠা
সূত্রপাত	.....	১১-১৬
ভারতবর্ষের লোককথা	.....	**১৭—১০৪**
লোককথা প্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত	.....	২৮
মহাভারত ও লোককথা	.....	৩৪
পঞ্চতন্ত্র-হিতোপদেশ	.....	৪২
জাতক	.....	৪৭
অত্যাচারী রাজার গল্প	.....	৪৯
বৃহৎকথা	.....	৬১
কথাসরিৎসাগর	.....	৬৪
শুকসপ্ততি	.....	৬৮
জনজাতির লোককথা	.....	৭৪
ভুট্টার দানা	.....	৯১

বিষয়		পৃষ্ঠা
ইউরোপীয় লোককথা	.....	১০৫
কেলটিক লোককথা	.....	১১৫
ফরাসী লোককথা	.....	১২৪
সিনডেরেল্লা	.....	১২৫
জার্মানীর লোককথা	.....	১৩০
রুশ লোককথা	.....	১৩৭
বাবা ইয়াগা ও পুনি	.....	১৪২
চাষীর ছেলে ইভান আর চুদো-য়ুদো	.....	১৪৪
জর্জীয় লোককথা		
কোয়ার্টার মাষ্টার শেয়ার্ল ও জারপুত্র	.....	১৫০
চীনদেশের লোককথা	.....	১৫৫
জাপানী লোককথা	.....	১৬৯
ওশেনীয় লোককথা	.....	১৮৩
আমেরিকার লোককথা	.....	১৯২
আফ্রিকার লোককথা	.....	২০০
সংযোজন	.....	২০৫-২৫৫
লোককথার প্রাচীনতম নির্দশন	.....	২০৭
দুই ভাই-এর গল্প	.....	২১৪
গণেশ জন্মের আদিকথা	.....	২২২
লোককথার আত্মা	.....	২৩৩
ড্র্যাগন—লোককথায় অলৌকিক প্রাণী	.....	২৪৭

বিশ্বলোককথার রূপরেখা
বিশ্বলোককথার রূপরেখা
বিশ্বলোককথার রূপরেখা

সূ ত্র পা ত

"নদী যেমন জলস্রোতের ধারা,—মানুষও তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পর দেখা হলেই,—প্রশ্ন এই—, কি হল হে, কি খবর। তারপরেই তারপরে'র সঙ্গে 'তারপরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা তৈরী হচ্ছে। তাকেই বলি—জীবনের কাহিনী, তাকেই বলি মানুষের ইতিহাস।

—রবীন্দ্রনাথ

মানুষের ইতিহাস সংগুপ্ত আছে বিশ্বময় লোককথায়। লোকসমাজে উদ্ভূত প্রবহমান মৌখিক গল্পধারাই লোককথা। নিজেকে বিশ্বময় প্রসারিত করার অসাধারণ ক্ষমতা নিয়ে তার আবির্ভাব। কোন্ আদিম যুগ থেকে তার যাত্রা সুরু, তা আমাদের অজ্ঞাত, কিন্তু দিক্‌দিগন্ত আবৃত করে তার অভিযাত্রা আজও অব্যাহত। সেই অভিযাত্রায় কখনও সে পদাতিক, কখনও সে পক্ষীরাজ ঘোড়ার সওয়ার। কখনও অকূল সাগরে তার জলযান পৌঁছে যায় রাক্ষস-খোক্কশের দ্বীপে। কখনও তার আশ্রয়—ভূত প্রেত দত্যিদানা হুরি পরীদের অলৌকিক জগৎ-এ। তার অনুগমন করে বচনশীল পশুপক্ষী সরীসৃপ; আবার, কখনও সে পথ হেঁটে যায় গ্রাম কিংবা নগরের দরিদ্র ভিক্ষুকের সঙ্গে কিংবা অরণ্যবাসী সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে। প্রাত্যহিক জীবনের পরিবেশ প্রতিবেশের সঙ্গেও তার একাত্মতা।— এইভাবে দীর্ঘকাল—সুদীর্ঘকাল—দীর্ঘপথ ধরে দেশ-বিদেশে তার পরিভ্রমণ। কালে কালে তার চেহারার পরিবর্তনও ঘটে যায়;—ঘটতেই থাকে। চলতে চলতে একদেশ থেকে আর একদেশে পৌঁছুলে তার নামধামও বদলে যায়। পরিবেশ-প্রতিবেশ বদলে গেলে, সেও বহুরূপীর মত রূপ পাল্‌টায়। তখন তার আদি নিবাসের কথা কেউ মনেও রাখেনা।

বস্তুত বিভিন্ন দেশের লোকসমাজের মধ্যে তার আত্মপ্রকাশ; লোকসমাজের মধ্যেই তার মৌলিক-রূপের উদ্ভব। তার অঙ্কুরোদ্‌গম হয়তো বা আদিম সমাজেই। প্রকৃতপক্ষে আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক কালের "লোকসমাজ" পর্যন্ত তার বিস্তার এবং আরও পরবর্তী কালের দিকে তার যাত্রাপথ অবিরাম।

'লোকসমাজ' বলতে কি বোঝায়, সে বিষয়ে বিতর্ক আছে। সাধারণভাবে লোকসমাজ এবং গ্রামীণসমাজ তেমন কোন পার্থক্যের সূচনা করে না। ভারতবর্ষের বাইরে থেকে, যাঁরা লোকসমাজ বা 'ফোক সোসাইটির' স্বরূপ সন্ধান করেছেন,—তাঁদের মধ্যে— হার্‌স্‌কোভিট্‌স্ অন্যতম। লোকসমাজ বলতে, তিনি ক্ষুদ্র এবং গণ্ডীবদ্ধ একটি সমাজকে বুঝিয়েছেন। বলাবাহুল্য,—তা পৃথিবীর কোন কোন ট্রাইব বা জনজাতির উপর প্রযোজ্য হলেও ভারতীয় পরিমণ্ডলে তার যথার্থতা থাকে না। ভারতীয় গ্রামীণ সমাজকে ভাষাগত বিভাজনে খণ্ড খণ্ড করে দেখার সুযোগ থাকলেও,— ঐ দৃষ্টিতে ভারতীয় লোকসমাজকে বিচার করা চলে না। বস্তুত ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ ভূমিতে বিভিন্ন জনজাতি, বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠী—বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এমন একটি ঠাস-বুনোটে আবদ্ধ—যাকে বিচ্ছিন্ন করা চলে না। কোন কোন জনজাতিকে বিচ্ছিন্ন ভাবে গোষ্ঠীগত ভাবে যে দেখা হয় না তা নয়, কিন্তু গভীরতর দৃষ্টিতে এই চিত্রই পরিস্ফুট হয় যে, ভারতীয় গ্রামীণ সমাজের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যেও এক অখণ্ড এবং

সামগ্রিক রূপ বর্তমান। তাই ভারতীয় লোককথাকে আঞ্চলিক কিংবা গোষ্ঠীগতরূপে গ্রহণ করা অসম্ভব। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথাকে পৃথক পৃথক নাম দিতে অভ্যস্ত হলেও, মূলত সামগ্রিকভাবে ভারতীয় লোককথার একটিমাত্র ভূমি—যার নাম ভারতবর্ষ। যথাযথভাবে লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় বিভিন্ন জনজাতির লোককথাও মূলত সর্বভারতীয় লোককথার স্বাভাবিক ঘনতায় আবদ্ধ।

কিন্তু হার্‌স্‌কোভিট্‌স্ যখন আফ্রিকার বিভিন্ন জনজাতি এবং আমেরিকার রেড্ ইণ্ডিয়ান জনজাতির কথা বলেন,—তখন অবশ্য তাঁর অভিমতকে অস্বীকার করা চলে না।

(২)

সাধারণত লোককথার মাধ্যমেই লোকসমাজের অভিপ্রায়, মূল্যবোধ, সামাজিক রীতিনীতি আচার আচরণ বিশ্বাসেরই পরিস্ফূরণ ঘটে। প্রকৃতপক্ষে লোককথা লোকসমাজের এমন একটি নিজস্ব জগৎ,-যার মধ্যে আদিম স্তর থেকে ক্রম-উত্তরিত লোকসমাজের বিভিন্ন পর্যায়গুলি বিন্যস্ত থাকে— এবং সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে যুক্ত হতে হতে জীবন-শক্তি আহরণ করতে করতে চলে। তাই লোককথার চরম বিনষ্টি ঘটেনা।

লোককথাকে কোনরূপ মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত করা চলে না। তার বৈশিষ্ট্য খুঁজে নিতে হয় শ্রুতিনির্ভর মৌখিক প্রবহমান ঐতিহ্যিক ধারা বা ট্র্যাডিশানের মধ্যে। মুখে মুখেই তার প্রবাহ। এইভাবেই এক জন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের দিকে তার অভিযাত্রা। রূপান্তরণের মধ্য দিয়েই তার অগ্রগমন। কালে কালে নতুন সংযোজনে লোককথার পরিধি বাড়তেও পারে এবং তার বিবর্তনও ঘটতে পারে কিন্তু লোককথার 'মোটিফ' গুলি বা বিশিষ্ট উপাদানগুলি কেন্দ্রচ্যুত হয় না। এ ছাড়া লোককথার মধ্যে এমন একটি বিশ্বজনীনতা থাকে, যা দেশ-কাল-জাতি-ধর্মকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়। লোককথাকে যদি পরিব্রাজকরূপে কল্পনা করা যায়, তাহলে লোককথাই পৃথিবীর সেরা পরিব্রাজক।

আধুনিককালে সংগৃহীত বিভিন্ন দেশের লোককথা কতখানি দেশজ এবং কতখানি বিদেশীয় সে বিষয়ে অবহিত হতে পারলে পরিব্রাজক লোককথার স্বরূপ চিহ্নিত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে লোককথার—পরিব্রজনের ক্ষমতা অসাধারণ। যাযাবর পাখির মতই তার উড়ে চলার ক্ষমতা। কোথাও সে বাসা বাঁধে, কোথাও শুধু ছুঁয়ে যায় অন্য কোন পরিবেশকে। কোন কোন সময় তাকে ভিন্‌দেশী বলে শনাক্তও করা যায় কিন্তু কোন কোন সময় নিজেকে সে এমনভাবে বদ্‌লে দেয় যে, তার মূল-অস্তিত্বকে আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। বস্তুত অনেক প্রাচীন কাল থেকেই দেশ-দেশান্তরে তার অভিযাত্রা এবং চংক্রমণ অব্যাহত। প্রসঙ্গত, মনে রাখতে হয়, বর্তমান কালে মুদ্রিত গ্রন্থের পাতায় ভর করে লোককথার গতায়াত বাড়লেও তার প্রভাবে প্রবহমান লোককথার পরিবর্তন ঘটে না। কারণ তার মৌলিক বাহন গ্রন্থ নয়, মুখ। মৌখিক ধারাতেই স্বদেশ থেকে বিদেশে, বিদেশ থেকে এদেশে তাকে পাড়ি দিতে হয়।

তাই পৃথিবীর এক অংশের সঙ্গে অন্যান্য অংশের ঘনিষ্ঠতা প্রাচীন কাল থেকে যে ক্ষেত্রে যত বেশী বেড়েছে, সেই সব দেশেই পারস্পরিক আদান-প্রদানের সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এদিক দিয়ে পৃথিবীকে মুখ্যত তিনটি পরিমণ্ডলে ভাগ করা যায়,—যার মধ্যে পারস্পরিক সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সম্ভাবনা বেশী পরিমাণে লক্ষিত হয়।

প্রথম পরিমণ্ডলকে বলা যেতে পারে—প্রাচীন পৃথিবী,— যার মধ্যে পড়ে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা। দ্বিতীয় পরিমণ্ডল--'দক্ষিণ মহাসাগরীয় অঞ্চল (পলিনেশিয়া-মেলানেশিয়া) এবং তৃতীয়

পরিমণ্ডল,—উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা। এই তিনটি বৃহৎ পরিমণ্ডলের মধ্যেই আবার অনেক উপমণ্ডল অবশ্যই বর্তমান। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, এই তিনটি পরিমণ্ডলের লোককথা স্ব-বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে এমন ঘনিষ্ঠ মিলও পাওয়া যায়,— যার ব্যাখ্যা মেলে না। বলাবাহুল্য,—সব ক্ষেত্রেই যে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রভাব আবিষ্কৃত হবে তা-ও নয়। তাই লোককথার বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অনেক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে।

বিশেষ করে এশিয়া এবং ইউরোপের লোককথা প্রসঙ্গে প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতিবিদ্ বেন্‌ফে-র অভিমত হচ্ছে—পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বিশেষ করে ইউরোপে ভারতীয় লোককথার পাখিরাই নীড় বেঁধেছে দীর্ঘকাল ধরে। বেন্‌ফে অবশ্য ঈশপের নীতিকথায় ভারতীয় লোককথার প্রভাবকে অস্বীকার করেছেন। কিন্তু ঈশপের অনেক নীতিকথার মধ্যেও ভারতীয় কাহিনীর প্রভাব অবশ্যই আছে। বস্তুত কোন ইউরোপীয় গবেষকই অস্বীকার করেন না যে, ইউরোপীয় ফোক্‌টেলস্ যখন ইউরোপ খণ্ডে প্রথম সংগৃহীত হয়, তার কয়েক হাজার বছর আগেই সেই সব লোককথার অধিকাংশই ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষই তার উদ্ভবভূমি। বলাবাহুল্য সেইসব লোককথা যে ভারতীয় পোষাকে আবৃত ছিল তা নয়; স্থান কাল ভেদে তার অনেক কিছুরই পরিবর্তন ঘটেছে এবং ইউরোপ থেকে কোন কোন লোককথা অনেক পরবর্তীকালে আমেরিকায় পৌঁছে, কোন কোন রেড-ইণ্ডিয়ান সমাজের লোককথা রূপেও গৃহীত হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তার খোল্ নলচে বদলে গেলেও তার মৌলিক স্বরূপটি আবিষ্কার করা অসম্ভব হয়নি। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার জুই ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটি লোককথার উল্লেখ করা যেতে পারে। উনিশ শ' আঠারো খৃষ্টাব্দে ই সি পার্সনস্ কর্তৃক এই লোককথাটি সংগৃহীত হয়।

'এক ছিল যুবতী মেয়ে। জাতিতে মেক্‌সিকান। ঘরের বাইরে যাবার কোন সুযোগই ছিল না তার; তাই যেখানে সূর্যের আলো এসে পড়তো সেইখানেই বসে থাকতো সে। চারদিকে কড়া পাহারা।

একদিন সূর্যদেব ওর গর্ভে একটি সন্তান দিয়ে গেলেন। প্রহরীরা একসময় জানতে পারলো যে মেয়েটি গর্ভবতী হয়েছে। ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলো যে এত পাহারা সত্ত্বেও যদি এমন ব্যাপার ঘটে, তা হলে পাহারা দিয়ে লাভ কি? তাঁর চেয়ে, ওকে হত্যা করাই ভালো।

ঠিক হলো, পরের দিন সকালে ওকে হত্যা করা হবে।

সন্ধ্যাবেলায় সূর্য এসে মেয়েটিকে বললো, কাল সকালে তোমাকে ওরা মেরে ফেলবে। মেয়েটি বললো— তা আর কি করা যাবে; মরবো! সূর্য বললো— না— তোমাকে আমি মরতে দেবো না; তোমাকে আমি বাইরে রেখে আসবো। পরের দিন, সূর্য তার 'অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে' মেয়েটিকে জানালার ভিতর দিয়ে ঘরের বাইরে নিয়ে এলো। বললো— এরপর যেখানে খুশী যেতে পার।

মেয়েটি হাঁটতে শুরু করলো। হাঁটতে হাঁটতে এক 'সিপালোয়া' ক্ষেতের কাছে এসে দেখলো—একজন চাষী কাজ করছে।

মেয়েটি বললো— কি পুঁতছো তুমি?

লোকটি বললো—কি আর পুঁতবো! গোল-গোল নুঁড়ি পুঁতছি।

মেয়েটি ভালো করে তাকিয়ে দেখে বুঝতে পারলো যে চাষী সত্যি কথা বলেনি। সে তখন বীজগুলোর দিকে তাকিয়ে এমন কিছু একটা করলো, যার ফলে বীজ থেকে অঙ্কুরের উদ্‌গমই হলো না। যেতে যেতে আর একজন চাষীর সঙ্গে দেখা।

মেয়েটি বললো— কি করছো?

চাষী বললো—গম আর ভুট্টার দানা পুঁতছি।

মেয়েটি আর, সেই সব বীজের দিকে তাকালো না। ফলে, যথাসময়ে সব বীজই চারা হলো; গাছ হলো। ফসল হলো প্রচুর।

ওদিকে প্রহরীরা যখন জানতে পারলো যে মেয়েটি পালিয়েছে, তখন ওরা দৌড়ুলো ওর খোঁজে। প্রথমে সেই 'নুড়ি-পোঁতা' এক চাষীকে দেখে, জানতে চাইলো— সে কোন মেয়েকে ঐ পথ ধরে যেতে দেখেছে কি না। চাষী বললো--দেখেছি; — ঐ পাহাড়ের দিকে গেছে।

ওরা দ্রুতপায়ে হেঁটে পাহাড়ে উঠলো। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলো না। ওরা আর একটা ছোট পাহাড় পেরিয়ে গেল। দেখলো সামনে এক নদী। বেশ গভীর। ওরা বললো--'আর খুঁজে লাভ নেই,' এই বলে প্রহরীরা ফিরে গেল।

মেয়েটি কিন্তু নদী পেরিয়ে ওপারে চলে গিয়েছিল। থামলো এসে ক্লুওয়েলা নামে এক জায়গায়। ক্লান্ত হয়ে সেইখানেই সে শুয়ে পড়লো। আর--যমজ সন্তানের জন্ম দিল।

শুয়োর আর কুকুর এসে মেয়েটিকে চুমু খেলো। তাই শুয়োর আর কুকুর অনেক বাচ্চার জন্ম দেয়। খচ্চরগুলো ওকে চুম্বন করেনি তাই ওদের বাচ্চা হয় না।

মেলভিল জে হার্সকোভিট্স্-এর অভিমত এই যে মৌলিক কাহিনীটি--বাইবেলের,--কিন্তু জুই ইণ্ডিয়ানরা সেই ধর্মীয় কাহিনীর রূপান্তর ঘটিয়েছে; তার সঙ্গে শুয়োর, কুকুর, খচ্চরের প্রকৃতিগত ক্রিয়াকে সংযোজিত করেছে। তিনি হেরোডের অত্যাচারে মেরীর গৃহত্যাগের সঙ্গে মেক্সিকান যুবতীর গৃহত্যাগ, অলৌকিক গর্ভসঞ্চার প্রভৃতির সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। বাইবেলে, শুয়োর কুকুরের খচ্চরের বাচ্চা হওয়া, না-হওয়ার কোন প্রসঙ্গ নেই বলে এই অংশটিকে রূপান্তরিত মূল কাহিনীর সঙ্গে সংযোজিত বলে মনে করা হয়েছে। বস্তুতঃ ঐ সব গৃহপালিত পশুরা কাহিনীর মুখ্য ভূমিকায় অনুপস্থিত বলে কাহিনীটিকে যথার্থ "অ্যানিম্যাল মিথ্" নামেও অভিহিত করা যায় না। কিন্তু মূল কাহিনীটি যে বাইবেলের তাও জোর করে বলা যায় না। অলৌকিক উপায়ে গর্ভসঞ্চার-এর মোটিফ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোককথাতেই বর্তমান। তার সঙ্গে সূর্যের সম্পর্কও অলভ্য নয়। ভারতীয় পুরাণেও তার নির্দশন আছে। মহাভারতের কুন্তী তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাই জুঁই ইণ্ডিয়ানদের এই কাহিনী, মৌলিক হতেও বাধা নেই। বলাবাহুল্য মেক্সিকান মেয়েটির যমজ সন্তান লাভের ঘটনাটিকেও হার্সকোভিট্স্ তেমন গুরুত্ব দেন নি।

প্রকৃতপক্ষে ট্রাইব বা জনজাতির মধ্যে কাহিনী, কিংবদন্তী, মিথ্ প্রভৃতি এমনভাবে সংগ্রথিত থাকে যে সাধারণ কথার সঙ্গে মিথ-কে বিচ্ছিন্ন করে দেখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। এইসব লোককথাকে অবলম্বন করে মিথ্ কিংবা ফেবলস্-এরও জন্ম হয়। উদাহরণ স্বরূপ সুসুয়াপ ইণ্ডিয়ানদের একটি লোককথার উল্লেখ করা যেতে পারে।

'এক ছিল ফড়িং মানুষ। ঘাস খেয়ে বেড়াতো। অন্য সবাই ওকে বলতো, চল হে,--সলোমন মাছ ধরতে যাই;--শীতকালের জন্য জমিয়ে রাখবো।

ফড়িং মানুষ ওদের কথায় কান দিল না। যখন শীতকাল এলো,--বরফে ঢাকা পড়লো ঘাস, তখন সেই ফড়িং মানুষ বাড়ী বাড়ী ঘুরে খাবার চাইতে লাগলো।

ওরা বললো--যাও, যাও--ঘাস খাও গে, কুঁড়ে--কোথাকার! কিন্তু কোথায় ঘাস!

সেই ফড়িং মানুষ ঘাস না পেয়ে একেবারে সত্যিসত্যি ফড়িং হয়ে গেলো। মানুষ থাকলো না।

এই লোককথাটিকে দু-ভাবে বিচার করা যেতে পারে। এক—একটি অলস ব্যক্তির শরীর, অন্নের অভাবে ক্ষীণ হয়ে গেল। দুই — কি করে ফড়িং-এর জন্ম হলো — তারই একটি মিথ্ তৈরী হলো। প্রথম ব্যাখ্যাটি সাধারণত গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ—লোককথা কোন রূপক সৃষ্টি করে না।

এই লোককথাটির সঙ্গে লা ফতেঁ-র সেই পিঁপড়ে ও ফড়িং-এর কাহিনীর সম্পর্ক থাকতেও পারে। 'ফড়িং সারা বছর নেচে কুঁদে বেড়াতো। খাবার সঞ্চয় করতো না। পিঁপড়ে কিন্তু সঞ্চয় করে রাখতো। খাবার সঞ্চয় করে রাখেনি বলে। শীতকালে ফড়িং-কে অভুক্ত থাকতে হলো। পিঁপড়ে--বলেছিল 'যে সারাবছর নেচেকুঁদে বেড়ায়, শীতকালে তার অন্ন জোটে না।'

লোককথা যে, অসাধারণ পরিব্রাজক--এবং দেশ থেকে দেশান্তরে গিয়ে চেহারার পরিবর্তন ঘটিয়ে দেশ-কালের উপযোগী হয়ে ওঠে। তাই লোককথার জন্মভূমিতেই সে আবদ্ধ থাকে না। যাযাবর পাখির মত উড়তে উড়তে পরিবেশ অনুসারে সে তার আকৃতি এবং প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজস্থ হয়ে পড়ে। তাই তার মূল আবিষ্কারের ক্ষেত্রে অনেক সময় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে--লোককথার মোটিফ গুলির প্রতি গভীর দৃষ্টিপাত করে তার যথার্থ্য নিরূপণ করতে হয়। বলাবাহুল্য--জীবনযাত্রার সাধারণ নিয়ম বর্হিভূত উপাদান গুলির মধ্যেই মোটিফের স্বরূপ চিহ্নিত থাকে। আর সেই মোটিফ যেন ট্র্যাডিশনাল বা প্রথাবদ্ধ ভাবে ঐতিহ্যিক হয়। তাই বিশ্বের লোককথা আলোচনায় মোটিফের গুরুত্ব অনেক।

এই প্রসঙ্গে মোটিফ্-এর স্বরূপ সম্পর্কে আর একটু বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। স্টিথ্ থমসন-এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,— মোটিফ হচ্ছে লোকযানের কোন অংশকে বিশ্লেষিত করার বিশিষ্ট উপাদান। লোকশিল্পে যেমন নক্সার এবং আকার প্রকারের কোন কোন বিশেষ ধারার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়, তেমনি লোকসংগীতেও সাংগীতিক প্যাটার্ন বা নির্দশন পরিলক্ষিত হয়। লোককথাতেও এই ধরণের উপাদান অনেক। ডাইনী, পরী, ড্রাগন, রাক্ষস-খোক্কশ প্রভৃতি অনৈসর্গিক বিষয়, বাস্তবজীবনে সংঘটিত অ-সাধারণ ঘটনাবলী, যাদুক্রিয়া এবং অনুরূপ নানা প্রবহমান উপাদান-ই মোটিফ্ রূপে চিহ্নিত হয়। প্রকৃতপক্ষে লোককথার সব উপাদানই মোটিফ নয়। যেমন কোন লোককথার সাধারণ মা মোটিফ নয়। কিন্তু হিংসুটে বিমাতা একটি মোটিফ।

কোন বিশেষ লোককথার আদি-ভূমি আবিষ্কারের ক্ষেত্রে মোটিফের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। যদিও অধিকাংশ লোককথার আদি ভূমি আবিষ্কার করা সহজ নয়। তবু অনেক ক্ষেত্রেই মোটিফের সাহায্যে অনেকদূর পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া যায় একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটিকে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। আমেরিকার ক্রিক ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে চালাক খরগোশ সম্পর্কে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। চালাক খরগোশ একবার এক হাতী আর এক হিপোকে ওর সঙ্গে দড়িটানার প্রতিযোগিতায় আহ্বান করেছিল। হাতী ছিল ডাঙায়, হিপো ছিল জলে। ওরা কেউ কাউকে দেখতে পায় নি। ওদিকে খরগোশ উঠে বসলো এক টিলায়। টিলার একদিকে লম্বা দড়ি ধরে থাকলো হাতী আর অন্যদিকে হাতী আর অন্যদিকে জলের মধ্যে হিপো ধরে থাকলো দড়ির আর একদিক। হিপো জানতো যে প্রতিযোগিতা হচ্ছে খরগোশের সঙ্গে। হয় খরগোস ওদের টিলার উপর টেনে তুলবে কিংবা খরগোসকে ওরা টেনে নামাবে।

খরগোস টিলার উপরে দড়ির মাঝখানে বসেছিল কিন্তু হাতী আর হিপোর ধারণা হয়েছিল যে টিলার উপর থেকে খরগোশই দড়ি ধরে আছে।

শুরু হলো টানাটানি। টানতে টানতে হাতী আর হিপো দু-জনেই হাঁসফাঁস করতে লাগলো। ওদের শক্তি ফুরিয়ে আসতে লাগলো। দু-জনেই ভাবলো--বাবা রে, ঐটুকু খরগোশের গায়ে এত জোর!"

এই কাহিনীর মধ্যে একটি মাত্র মোটিফ বর্তমান--যা হচ্ছে 'টাগ অব্ ওয়ার' বা দড়ি টানাটানির প্রতিযোগিতা।

প্রশ্ন উঠতেই পারে--এই কাহিনী কি ক্রিক্ ইণ্ডিয়ানদের নিজস্ব? নাকি--ওর উৎস আছে অন্য কোন ভূমিতে, অন্য কোন জাতির মধ্যে!